Vol. 6 | No. 2 | 1962

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ইন্দো-পাক সঙ্গীতের ইতিহাস

Volume	6
Issue	2
Year	1962
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	কাজী মোতাহার হোসেন
Published online	December 16, 1962
DOI	10.62328/sp.v6i2.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v6i2.7
Pages	214-224
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

গ্রন্থ পরিচয়

Check for updates

॥ ইন্দো-পাক সঙ্গীতের ইতিহাস ॥

(অধ্যাপক অবদুল হালীম, এম. এ., পি. এইচ. ডি প্রণীত, মূল্য ৩·৫০ টাকা ॥
প্রথম সংস্করণ, ১৯৬২ ; এসিয়াটিক প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক—গ্রন্থকার।)

বইখানা বিভিন্ন সময়ে ইংরেজী ভাষায় লিখিত তেরটি প্রবন্ধের সমষ্টি। এর কোনও কোনওটি বিশ পঁচিশ বছর আগেকার লেখা, আবার কোনও কোনওটি পুস্তক প্রকাশের দুই এক বৎসর আগেকার। বিষয়বস্তুঃ পাক-ভারতীয় সঙ্গীত, সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক, সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ, সঙ্গীতগ্রন্থ, সঙ্গীতরীতি, ইত্যাদি। প্রতি পৃষ্ঠায় সঙ্গীতের প্রতি গ্রন্থকারের গভীর অনুরাগ, তথ্য সংগ্রহে কঠোর পরিশ্রম স্বীকার এবং যন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীত সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বয়ং-সম্পূর্ণ প্রবন্ধাবলীর একত্র সমাবেশে রচিত বলে, বইখানিতে স্বভাবতই অনেক তথ্য একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে—প্রধান কথাগুলো ভাল করে মনের ভিতর বসবার সুযোগ পেয়েছে।

সঙ্গীতের মত মনোহর আর্টের প্রতি জন-সাধারণের ভালবাসার আকর্ষণ থাকলেও বোধহয় হাজার-করা নয় শ' নিরানব্বই জনই এতে প্রকৃতপক্ষে অনুরাগী নয়, এমন কি, তাদের স্বরগ্রামেরও বোধ নাই। তাই, সঙ্গীতের মানোন্নয়ন করতে হলে শিশু শিক্ষায় কিছু সঙ্গীত ও সুর-সহযোগে আবৃত্তির ব্যবস্থা থাকা চাই। গ্রন্থকার একথা উল্লেখ করেছেন—বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে এ-বিষয় সংযোজিত হয়েছে তা-ও বলেছেন। এ-টি আশার কথা বটে, কিন্তু কয়েকটা বিশেষ প্রতিষ্ঠান ছাড়া সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক সঙ্গীত-শিক্ষা ব্যাপারে কোনই অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। পাক-ভারত উপমহাদেশে কোথায় কোথায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, গ্রন্থকার তার তালিকা দিয়েছেন ; কিন্তু এব্যাপারে পাকিস্তানে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়েছে বলে জানা যায় না। এমন কি, আর্ট কাউন্সিল যে উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল, তা-ও প্রায় ব্যর্থ হয়েছে বলতে হবে। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানে বর্তমানে সঙ্গীত-সাধনা কি স্তরে আছে, তার কি পরিমাণ পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে ; এবং ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা প্রভৃতি মার্গ-সঙ্গীতে কোন্ কোন্ গুণী, কোন্ কোন্ যন্ত্রী, কোথায় কি ভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন, তার বিস্তারিত বিবরণ

[Essays on History of Indo-Pak Music by Dr, Abdul Halim M. A. Ph-D]

দিয়ে গ্রন্থকার তরুণ শিল্পীদের উৎসাহ বর্ধন করেছেন, আর প্রতিষ্ঠিত গুণিগণকেও বিভিন্ন অঞ্চলের সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত করে দিয়েছেন। এতে উভয় অঞ্চলের গুণীদের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হতে পারে, এমন আশা করা বোধ হয় অন্যায় হবে না। অন্তত শিক্ষানুরাগী তরুণ আর্টিস্টরা কোথায় কার কাছে গেলে বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে রেয়াজ করবার সুবিধা পেতে পারেন, এ সম্বন্ধে অনেকটা সুস্থির ধারণা করে নিতে পারবেন।

বলা বাহুল্য, বইখানাতে পাক-ভারতের কেবল মার্গ-সঙ্গীতের বিবরণই দেওয়া হয়েছে। উন্মার্গ সঙ্গীতের দ্বারা যাতে তরুণ যুব-সম্প্রদায় অতি মাত্রায় প্রভাবিত হয়ে না পড়েন, সে জন্য গ্রন্থের শেষদিকে বিশেষ সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়েছে। এ সম্পর্কে প্রথমত সিনেমা সঙ্গীতের কথা উল্লেখ করেছেন, দ্বিতীয়ত উৎসব-আনন্দের ক্ষেত্রে মিলিটারী ব্যাগপাইপ বা স্কটিশ ব্যাণ্ড আমদানীর আধুনিক রুচির প্রতি কটাক্ষ করেছেন। বিবাহ উৎসবাদির মত ঘরোয়া ব্যাপারে আমাদের দেশীয় যন্ত্র-সঙ্গীত ও কণ্ঠ-সঙ্গীতের উপযোগিতার কথাও উল্লেখ করেছেন। জাতীয় গৌরবের দিক দিয়ে গ্রন্থকারের মত অবশ্যই গ্রহণীয়। এইবার এই তথ্য-বহুল গ্রন্থখানিতে যে সব বিষয়ের উল্লেখ আছে, তার কিছুটা পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। কারণ বিশেষজ্ঞের লেখা হলেও তিনি সাধারণ পাঠকের বুঝবার মত করেই সহজ ভাষায় তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন।

প্রথমেই সঙ্গীতের শ্রেণী বিভাগের কথা উঠে পড়ে। তা এই ঃ ভারতবর্ষে, বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যে খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর অনেক আগের থেকেই বেশ উৎকর্ষ ছিল। এর মধ্যে উত্তমশ্রেণীর সঙ্গীত ধ্রুব-পদ, ধ্রুপদের অর্থাৎ যে সব পদ বা শ্লোক আবৃত্তি করবার বা গাইবার নির্দিষ্ট নিয়ম বাঁধা ছিল, যার নড়চড় করা দূষণীয় মনে হ'ত। অবশ্য, কায়দা কানুনগুলো যাঁরা তৈরী করেছিলেন তাঁরা শিল্পমাধুর্য ও গাম্ভীর্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই তা করেছিলেন। কিন্তু সবাই ত আর শিল্পী নয়, তাই গায়ক ও বাদকেরা একে একরকম গাণিতিক ফরমুলা বা সূত্রের পর্যায়ে এনে ফেলেছিলেন। আবার যখন গায়ক ও বাদকের মধ্যে আড়াআড়ি চলতো, তখন এঁরা আপন আপন সূত্র ধরে অন্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে দুন, চৌদুন, সওয়াইয়া, দেড়িয়া প্রভৃতি দ্রুতলয়ে বাহাদুরী দেখাতেন। ফলে সঙ্গীত আপন সৌকুমার্য হারিয়ে হয়ে পড়ত একটা বড় রকমের প্রাণহীন কসরত। আর এক কথা এই যে, দেবতা ও মহাপুরুষদের প্রীতির উদ্দেশ্যেই বিশেষ গাম্ভীর্য বজায় রেখে ধ্রুপদ গীত হত। সুতরাং

হালকা লয় এর সঙ্গে সুসমঞ্জস ছিল না,—ধামার, তেওরা, চৌতাল, মধ্যমান, আড়াঠেকা প্রভৃতি বহুবিধ কুটতালে বিলম্বিত লয়ে এবং প্রত্যেকটি স্বরে বেশ কিছুক্ষণ স্থিতি করে এক একটি গান দেড় ঘণ্টা দুই ঘণ্টা বা আরও অধিকক্ষণ ধরে গাওয়াই কৃতিত্বের বিষয় বলে গণ্য হ'ত।

এই গানের সঙ্গে আরব ও পারশ্যের সঙ্গীত রীতির যথেষ্ট মিল ছিল। লাল খাঁ বার্নি কর্তৃক রচিত পারস্য ভাষায় লিখিত "মৌজে-মুসিকী" (=সঙ্গীত-তরঙ্গ) নামক পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে, অন্ততঃপক্ষে ২২টি ভারতীয় রাগ (রামকেলী, ভায়রোঁ, পূরবী, মালকৌষ, সারং, বিহাগড়া নট নারায়ণ, ধানেশ্রী প্রভৃতি) পারসিক রাগের অনুরূপ। অবশ্য, সঙ্গে সঙ্গে পারসিক রাগগুলির নামও উল্লেখ করা হ'য়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মুসলমানেরা যখন এদেশে আসেন, তখন এঁরা ভারতীয় সঙ্গীতের অনুরূপ একটি সঙ্গীতরীতির অধিকারী ছিলেন।

অবশ্য পার্থক্যও ছিল। ভারতী সঙ্গীত ছিল প্রধানত দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত, কিন্তু আরব্য-পারশ্য সঙ্গীত ছিল মানবীয় ভাবও অনুভূতির প্রকাশক—মুসলমানের সাহচর্যেই ভারতীয় সঙ্গীতের প্রভূত উৎকর্ষ হ'য়েছে। বিশেষ করে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর রাজত্ব কালে সুবিখ্যাত পার্শী ও হিন্দী কবি এবং সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ নায়ক আমীর খসরু ভারতীয় ও আরব্যপারসিক উভয় পদ্ধতিতেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সঙ্গীতে 'নায়ক' উপাধিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

এর নীচেই গন্ধর্বের স্থান। যিনি বর্তমান ও অতীত কালের সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক উভয় দিকেই পারদর্শী তিনিই 'নায়ক'। আর যিনি বর্তমান ও অতীত কালের শুধু ব্যবহারিক দিকে পারদর্শী তাঁর উপাধি 'গন্ধর্ব'। আশ্চর্যের বিষয়, আকবর বাদশার দরবারের বিখ্যাত গুণী তানসেনও নায়ক ছিলেন না, তিনি ছিলেন গন্ধর্ব। আলোচ্য গ্রন্থ থেকে পাকভারতের কয়েকজন নায়ক ও গন্ধর্বের নাম উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

নায়ক ঃ গোপাল, আমীর খসরু, গোপাল (২), পাণ্ডে, লোহাং, করন (কর্ণ) মাহ্‌মূদ, বখ্‌শু, ভানু, বৈজু, চর্যু, ভারু, ধুন্দি, ও গুণ সেন। লাল খাঁ কলাবন্ত ও রঙ্গ খাঁ কলাবন্ত ও বড় ওস্তাদ ছিলেন। এঁরা গন্ধর্বের চেয়ে উচ্চ ছিলেন, হয়ত প্রায় নায়কের সমকক্ষ ছিলেন।

গন্ধর্ব ঃ বায বাহাদুর, তানসেন, হুসেন শাহ শর্কী, মীর্জা জুলকারনায়ন।

আমীর খসরুর *জন্ম হয় ১২৫৪ সালে পাতিয়াল নামক একটি ক্ষুদ্র শহরে। এঁর পিতা ছিলেন তুর্কি আর মাতা ছিলেন দিল্লীর এক আমীরের কন্যা। তেইশ বছর বয়স থেকেই আমীর খসরু কবি হিসাবে রাজসভায় স্থান পান। আমীর খসরুর পৃষ্ঠ-পোষকদের মধ্যে সুলতান আলাউদ্দীন খলজী ছিলেন সর্বপ্রধান। তাঁর রাজত্ব কালেই সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে তাঁর যশঃ-সৌরব বিস্তৃত হ'য়ে পড়ে। এই রাজদরবারেই ভারত-বিখ্যাত নায়ক গোপালের সঙ্গে তাঁর সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হয়। নায়ক গোপাল ছিলেন দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী। তাঁর ১২০০[১] অনুরক্ত শিষ্য পর্যায়-ক্রমে তাঁর পাল্কী বহন ক'রে গৌরব বোধ করত। একবার তিনি থানেশ্বরে কুরুক্ষেত্র-সরোবরে তীর্থ স্থানে গমন করেছিলেন। তখন সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর নিমন্ত্রণে রাজসভায় এসে ক্রমান্বয়ে সাতদিন[২] নানা প্রকার রাগরাগিণীর কর্তব প্রদর্শন করেন। এই কয়দিন আমীর খসরু অন্তরালে থেকে (সিংহাসনের নীচে লুকিয়ে) এ-সব শুনেছিলেন। অষ্টম দিনে[৩] তিনি তাঁর দুই শিষ্য সামাৎ ও নিয়াযকে

*আমীর খসরু ক্রমান্বয়ে এগারটি রাজসভার সভাকবি পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের নাম যথাক্রমে ঃ

১ আলাউদ্দীন মুহম্মদ কুশীলখাঁ, ওরফে মালিক ফজ্জু [সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র] ২ নাসীরউদ্দীন বাঘরা খাঁ [বলবনের দ্বিতীয় পুত্র]; ৩ খান-ই-শহীদ সুলতান মুহম্মদ [বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র]; ৪ আমীর আলী সরজন্দার [অযোধার সুবাদার]; ৫ সুলতান মুঈজউদ্দীন কায়কোবাদ [বাঘরা খাঁর পুত্র] ৬ সুলতান জালালউদ্দীন খলজী; ৭ সুলতান আলাউদ্দীন খলজী [১২৯৬] ৮ সুলতান শাহাবউদ্দীন ওমর [আলাউদ্দীন খলজীর কনিষ্ঠ পুত্র]; ৯ সুলতান কুতুবউদ্দীন মুবারক শাহ [আলাউদ্দীন খলজীর তৃতীয় পুত্র] ১০ সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুগলক; ১১ সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলক। মুহম্মদ তুগলকের সিংহাসন আরোহণের কয়েক মাস পরেই আমীর খসরুর মৃত্যু হয়।

১) মতান্তরে ১৬০০ শিষ্য ("রাগদর্পণ" থেকে মৌলানা শিবলী কর্তৃক উদ্ধৃত। মুহম্মদ হাবীব কৃত "হজরত আমীর খসরু অব দিল্লী" দ্রষ্টব্য। আলীগড় ইউনিভার্সিটি পাবলিকেশন, D. B. Taraporevala & co. Hornby Road, Bombay.)

২ মতান্তরে ছয় দিন হাওয়ালা (৩) মতান্তরে সপ্তম বৈঠকে হাওয়ালা ঐ।

নিয়ে মজলিসে যোগদান করেন। খসরুর অনুরোধে প্রথমে নায়ক গোপাল গান করলেন, তারপর খসরুও তাল-মান-লয় সহযোগে ঠিক যেমন করে এ কয়দিন নায়ক গোপাল গেয়েছিলেন সে সমুদয়ের পাল্টা গান গেয়ে শুনালেন।

গোপালের 'গীত' এর স্থলে খসরু শুনালেন 'কওল' ও 'বাসিৎ'; গোপালের 'মান'-এর স্থলে শুনালেন 'তিতালা' ও 'নক্‌শ'; 'আলাপ' এর স্থলে 'নিগার'; সূত (সূত্র ?) -এর-স্থলে 'তরানা'; এবং 'ছান্দ'এর স্থলে 'বাসিৎ'। এ শুনে নায়ক গোপাল চমৎকৃত হয়ে গেলেন, সভাশুদ্ধ সকলে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠল। এর পর খসরু স্বরচিত পদ গেয়ে শুনালেন, এবং নিজের উদ্ভাবিত নতুন নতুন রাগ-রাগিণী শুনিয়ে সকলকে মোহিত করে দিলেন। এইভাবে খসরু সঙ্গীতবিদ্যায় 'নায়ক'-এর সম্মানিত উপাধি প্রাপ্ত হ'লেন।

সঙ্গীতের উপরে উল্লিখিত বিভাগ ছাড়াও নায়ক আমীর খসরু 'কলওয়ানা' 'গুল' 'হাওয়া' 'সুহেলা' প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি যে-সব নূতন রাগ সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে 'পনম,' 'গারা', 'ফরগানা', 'মুজীর,' 'মুওয়াফিক' 'সনম' 'সাযগারী', 'উশ্‌শাক,' 'ইয়ামন', 'জিলাফ' 'সরফর্দা' প্রভৃতি এখনও প্রচলিত আছে। তালের দিক দিয়েও তিনি প্রায় সতরটি নতুন তাল সৃষ্টি করেছিলেন; তার মধ্যে 'খাম্‌সা', সওয়ারী, ফিরদস্ত, যৎ, পশ্‌তু, আড়া চৌতাল, সুর ফাক্তা ও ঝুম্‌রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তিনি সেতার, তবলা, রবাব ও ঢোলক এই কয়েকটি বাদ্য যন্ত্রেরও উদ্ভাবন করেন।

গ্রন্থকারের মতে আমীর খসরুর আর একটি বিশেষ দান এই যে তিনি ধ্রুপদের জটিলতা ও গাম্ভীর্যের বাইরে ইণ্ডোপাক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আর একটি নতুন পদ্ধতির প্রচলন করেছিলেন যাকে সালঙ্কার ও চল-চঞ্চল সঙ্গীত বলা যায়। বর্তমানে এর নাম হচ্ছে খেয়াল। খেয়ালের স্বর দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হয়, সুতরাং এ হচ্ছে অধ্রুব-পদ সঙ্গীত। এতে মানবীয় ভাবের, বিশেষ করে প্রেম-পদের প্রাধান্য রয়েছে। ধ্রুপদের অস্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ—এই চার অঙ্গের মধ্যে কেবল প্রথম দুটি অঙ্গেই খেয়ালের সৌন্দর্য বিকাশ সম্ভব হয়। এর তাল ও রাগিণীও অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা। আমীর খসরু ধ্রুপদও গাইতেন, খেয়ালও গাইতেন। কিন্তু তাঁর সময়ে ধ্রুপদেরই প্রাধান্য ও প্রচলন অধিক ছিল। এর প্রায় এক শ' সওয়া শ' বছর পরে জৌনপুরের অধিপতি সুলতান হুসেন শাহ শর্‌কী (১৪৫৭-১৪৮৩) খেয়াল ঢংএর প্রতি অধিক জোর দেন। বাস্তবিক

এঁর প্রভাবেই দৃঢ়বদ্ধ ধ্রুপদের জনপ্রিয়তা হ্রাস হ'য়ে বিমুক্ত মধুস্রাবী খেয়ালের সমধিক প্রচলন হয়। সুলতান হুসেন শর্‌কী সঙ্গীতে গন্ধর্ব ছিলেন। তিনি যে সকল রাগ-রাগিণীর প্রচলন করেন, তার মধ্যে জংলা, শ্যামা (চৌদ্দ প্রকার), টোড়ী (চার প্রকার), জৌনপুরী (= আশাবরী) এবং হুসেনী কানাড়া প্রধান। তিনি সঙ্গীতের একজন উৎকৃষ্ট পদ-কর্তাও ছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরু থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ কালের মধ্যে পাক-ভারত সঙ্গীতের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হ'য়েছিল। জৌনপুরকে ত তখন ভারতের 'শিরাজ' বলে গণ্য করা হ'ত। এই সময় কাশ্মীরের রাজা সুলতান যয়নুল আবেদীন, গোয়ালিয়ের অধিপতি কিরাতসিংও সঙ্গীতের বিশেষ পৃষ্টপোষক ছিলেন। জৌনপুরের ইব্রাহীম শাহ শরকী (১৪০১-১৪৪০) 'সংগীত শিরোমণি' নামে একখানা পুস্তক সম্পাদন করেন। হুসেন শাহ্‌র কথা ত বলাই হ'য়েছে। কিরাত সিংহের পুত্র রাজা মানসিং তন্‌ওয়ার (১৪৮৬-১৫১৭) পাঁচজন সঙ্গীত নায়কের তত্ত্বাবধানে 'মান কৌতূহল' নামক একখানা প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করান। সে সময় ভারতীয় সঙ্গীতের উপর পারস্য প্রভাব পড়ায় অনেক নতুন নতুন রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি হ'চ্ছিল, আর এ সবের কোনও নির্দিষ্ট রূপ না থাকাতে ওস্তাদে ওস্তাদে প্রবল মত-বিরোধ ছিল। তাই নায়ক বখ্‌শু, নায়ক ভানু, নায়ক মাহ্‌মুদ, নায়ক করন্ এবং নায়ক লোহাং-এর অনুমোদিত 'মান-কৌতূহল' নিশ্চয়ই সঙ্গীতের অরাজকতা দূর করবার কাজে যারপর নাই সহায়তা করেছিল। 'মান কৌতূহলে' সম-সাময়িক কালের প্রায় সমুদয় রাগ-রাগিণীরই উল্লেখ আছে। কিছুকাল পর এর একখানা পার্শী তরজমা ক'রে তার নাম দেওয়া হয় রাগদর্পণ। কথিত আছে, বর্তমানে ধ্রুপদের আমরা যেরূপ দেখতে পাই, তা রাজা মানসিংহেরই দেওয়া। এর আগে যে ধ্রুপদ গাওয়া হ'ত তা' সংস্কৃত ভাষায় রচিত হ'ত আর গীত, ছন্দ্‌ ও মান এই তিন প্রণালীতে গীত হ'ত।

মানসিংহের এই যুগান্তকারী প্রচেষ্টার ফলেই উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত ও কর্ণাটী সঙ্গীত পৃথক হ'য়ে পড়ল।

চিশ্‌তিয়া তরীকার মুসলিম মরমীগণ, এবং পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ভক্ত কবিগণ ধর্ম-সাধনায় সঙ্গীত ব্যবহার করতেন। আমীর খসরু ও তাঁর শিষ্যদ্বয়ের 'কওল' সঙ্গীত, এবং মীরা বাই, বাবা রামদাস, সুরদাস ও স্বামী হরিদাস ভজন, এসম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

মোগল যুগে আক্‌বর বাদশাহ্‌র রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে একজন সভাকবির রচিত ধ্রুপদগান 'দুর্গা' রাগিণীতে গীত হ'য়েছিল। আকবরের রাজসভায় গোয়ালিয়র, মাশ্‌হাদ, তাব্রিজ ও কাশ্মীর থেকে বহু সংখ্যক যন্ত্র-শিল্পী কণ্ঠশিল্পীর সমাগম হয়েছিল। এর মধ্যে ছিলেন মিরা তানসেন (গন্ধর্ব), বাবা রাম দাস, বাযবাহাদুর (গন্ধর্ব), নায়ক চর্যু, মিয়ালাল, সুবহান খাঁ, বিচিত্র খাঁ, তানতরঙ্গ খাঁ, মুহম্মদ খাঁ ধারী*, দাউদ খাঁ ধারী, সুরদাস, রামদাস, পারবিন খাঁ, মীর সৈয়দ আলী, উস্তা ইউসুফ, প্রভৃতি দেশ-বিদেশের গুণিগণের সমাগম হ'য়েছিল।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে নাদ আলী, বিলাস খাঁ (তানসেনের পুত্র), মির্জা যুলকারনায়ন (গন্ধর্ব) ও মিয়া আকীল ছিলেন।

সম্রাট শাহ্‌জাহানের দরবারে অনেক উচ্চ-গুণ সম্পন্ন আর্টিস্টের সমাগম হ'য়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে এ সময় দেশে সুখ-শান্তি ছিল, আর সঙ্গীতও সুমার্জিত রূপ পেয়েছিল, এবং হুসেন শাহ শরকী কর্তৃক পুনরুজ্জীবিত খেয়াল সঙ্গীতের যথেষ্ট পুষ্টি সাধিত হ'য়েছিল। তানের সাহায্যে মনোহর সুরবিস্তারের দিকে ওস্তাদদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'য়েছিল। শেখ বাহাউদ্দীন (অমৃতবীণকার) শের মুহম্মদ (পদ রচয়িতা); লাল খাঁ গুণ-সমুদ্র (ধ্রুপদী এবং বিলাসখাঁর জামাতা ও শিষ্য) জগন্নাথ মহাকবি রায় (দক্ষিণী সঙ্গীতজ্ঞ ও কবি); গুণসেন (ধ্রুপদী), খুশহাল খাঁ (গুণ-সমুদ্র), মিস্‌রী খাঁ, গুণ খাঁ প্রভৃতি সঙ্গীতবিশারদের দ্বারা সম্রাট শাহ্‌জাহানের দরবার অলঙ্কৃত হয়েছিল।

আওরঙ্গজেবের রাজত্ব কালের প্রথম দশ বছর সঙ্গীতে উৎসাহ দান করা হয়েছিল, কিন্তু তারপর থেকে গায়ক, বাদক, নর্তক, নর্তকী সকলেরই বিশেষ দুর্দিন উপস্থিত হ'য়েছিল। শুনা যায় বিরাট এক জনতা এক সময় বাদশাহ্‌র প্রাসাদের নিকট দিয়ে একটি সুসজ্জিত তাবুত (শবাদার) নিয়ে যাচ্ছিল। বাদ্‌শাহ জিজ্ঞাসা ক'রে যখন জানতে পারলেন, যে 'সঙ্গীত'-কে দফন করবার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন তিনি বলেছিলেন, "বেশ গভীর করে কবর দিও, যাতে সেখান থেকে আর যেন কোনও শোর-শব্দ না উঠতে পারে।"

মোগলরাজত্ব কালের শেষের দিকে বে-খবর বাদশা বাহাদুর শাহ্‌ (১৭০৭-১৭১২) বিশেষ সঙ্গীতোৎসাহী ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত সভাসদ ছিলেন নিয়ামত খাঁ (সদারঙ্গ) ধ্রুপদ, খেয়াল, তরানা (সম্ভবত হোলি ও সদ্‌রা) প্রভৃতি অত্যন্ত

* 'ধারী"-রা যাযাবর সঙ্গীত-ব্যবসায়ী।

নিপুণভাবে বৈচিত্র্যময় করে গাইতে পারতেন। তিনি নিয়াযী কাওয়াল ও লালাবাঙ্গালীর সহযোগিতায় অজস্র সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, এবং অনেক গুলোর ভনিতায় নিজের নামের সঙ্গে পরবর্তী সম্রাট মুহম্মদ শাহ্‌র ১৭১৯-৪৮ নামও জুড়ে দিয়েছিলেন। তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং নিজে কয়েকটি গান রচনা করেছিলেন। বর্তমানে যে-সব 'খেয়ালের' প্রচলন আছে তার শত করা ৭০ ভাগেই সদারঙ্গ কিম্বা মুহম্মদ শাহ্‌ পিয়া সদারঙ্গিলে'র ভনিতা রয়েছে। অন্যান্য গায়কদের মধ্যে শেখ মুঈনউদ্দীন (বিখ্যাত 'খেয়ালী') এবং ফিরোজ খাঁ-ই (নে'য়মৎ খাঁর শিষ্য ও জামাতা) ছিলেন প্রধান।

১৮৫৭ সাল পর্যন্ত লক্ষ্ণৌ ও রামপুরই উত্তর ভারতের প্রধান সঙ্গীত কেন্দ্র হ'য়ে পড়েছিল। লক্ষ্ণৌ-এর নওয়াব-উজীর আসাফউদ্দৌলার শাসন কালে পাটনানিবাসী মুহম্মদ রাজাখান ১৮১৩ খ্রীঃ 'নগমা-ই-আসিফী' নামক একখানা পুস্তক রচনা ক'রে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক নবযুগ সৃষ্টি করেন। প্রাচীন পন্থায় ছয়-রাগ ছত্রিশ রাগিণীর, এবং এই সব রাগ রাগিণীর জনক, পুত্র, কন্যা, ভার্যা ইত্যাদি মিলে অসংখ্য রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হয়। ফলে রাগরাগিণীর শ্রেণী নির্দেশ করার জন্য অন্তত চারিটি বিভিন্ন মতের আবির্ভাব হয়। এই বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য রাজা খাঁ এক বৈজ্ঞানিক পন্থা উদ্ভাবন করেন। তিনি শুদ্ধ স্বর গুলোকে 'বিলাওল ঠাট' মেনে নিলেন, এবং 'খরজ' (=সা) ছাড়া অন্যান্য কড়ি, কোমল ও শুদ্ধ স্বর থেকে আরম্ভ ক'রে পর্দাস্তরগুলো ঠিক রেখে আরও এগারটি ঠাট নির্দেশ ক'রে, এই সব ঠাটের ভিত্তিতে রাগ-রাগিণীর শ্রেণী বিভাগ করলেন। রাজা মানসিং তনয়ার 'মান কৌতূহলে' তৎকালে প্রচলিত রাগরাগিণীর পঞ্চনায়ক সম্মত সঠিকরূপ নির্দেশ করেছিলেন, আর রাজা খাঁ 'নগমা-ই-আসিফী'তে বৈজ্ঞানিক ঠাট অনুসারে রাগরাগিণীর বিজ্ঞান সম্মত শ্রেণী বিভাগ করলেন। এ পর্যন্ত কেবল দক্ষিণ-ভারতীয় সঙ্গীতেরই সুনির্দিষ্ট রূপ ছিল, এখন উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের রাগরাগিণীর বিচারে একটা সুনির্দিষ্ট ধারার সন্ধান মিললো।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজিক ও নৈতিক দুর্বলতার ফলে দেশের শাসন বৈদেশিকদের হাতে চলে যেতে থাকলো। এ অবস্থাতেই দেশের লোকে অসহায় অবস্থায় আমোদ-প্রমোদ, মোরগের লড়াই, যাত্রা-তর্জা, জুয়াখেলা ইত্যাদি সহজলভ্য ব্যাপার নিয়েই মত্ত রইল। ধ্রুপদের ত কথাই

নাই, খেয়াল গাইতেও যথেষ্ট ধৈর্য ও রীতিমত শিক্ষার প্রয়োজন, তাই এঁরা আরও হাল্‌কা ঢং এর সঙ্গীত— লক্ষ্ণৌ ঠুংরী ও টপ্পার দিকেই ঝুঁকে পড়লেন। ঠুংরীকে বলা যায়, এক প্রকার নিম্নস্তরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রেমগীতি, যার মধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকার রূপ-বর্ণনা, বিরহ-ব্যাকুলতা এবং অভিসারাদিই মুখ্য, এবং বিশেষ বিশেষ শব্দ বা শব্দগুচ্ছের বহু ভঙ্গিম মনোরম সুরবিন্যাসেই কর্তবের বাহাদুরী ও চরম সার্থকতা। খেয়ালও প্রেম-সঙ্গীত,-কিন্তু সেখানে সাধারণত ঐশী প্রেমের রূপক হিসাবেই মানবীয় প্রেমের বর্ণনা এবং সময়ে সময়ে সাক্ষাৎভাবেই ঐশী প্রেমের দৃঢ়সংবদ্ধ অথচ মনোরম প্রকাশ হয়। টপ্পার আবিষ্কারক শোরীমিয়া। এর সুর সিন্ধু, পেশাওয়ার ও পাঞ্জাবের উট-চালকদের 'ধূনের' এর অনুসরণে রচিত। অর্থাৎ আঞ্চলিক লোক-সঙ্গীতকে কিছু মার্জিত করে শোরীমিয়া একে ভদ্র বা অভিজাত সমাজের গ্রহণ-যোগ্য রূপ দিয়েছিলেন। স্মরণ রাখতে হবে, ধ্রুপদ ও খেয়ালে সঙ্গীত-ব্যাকরণের রীতি-সম্মত বা শাস্ত্রীয়-নিয়ম মানতেই হবে, কিন্তু ঠুংরী ও টপ্পায় তেমন বাধ্য বাধকতা নেই। অবশ্য, ঠুংরী ও টপ্পার আবির্ভাবে খেয়াল ও ধ্রুপদ উৎখাত হ'য়ে যায়নি। এরা সহ-অবস্থানের নীতি অবলম্বন করে যার যার মত বেঁচে রয়েছে।

নওয়াব ওয়াজেদ আলী (অযোধ্যার শেষ নওয়াব), ওস্তাদ ফৈয়াজ হোসেন খাঁ এবং রামপুর দরবারের নওয়াব কল্‌বে আলী খাঁ, উজীর খাঁ (বীণকার), পিয়ারে সাহেব (ধ্রুপদিয়া), মুস্তাখাঁ (খেয়ালী), আলীরাজা খাঁ (কাওয়াল, কলওয়ানা গায়ক), ফিদা হোসেন (সরোদী), বিন্দাদিন (নর্তক ও পদ-কর্তা), ওস্তাদ মুশতাক হোসেন খাঁ (খেয়ালী), সাদেক আলী খাঁ বীণকার, আহমদ জান থিরাকওয়া (বিখ্যাত তবলচি), আছনবাই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর গৌরব রক্ষা করেছেন।

এ ছাড়া মুহম্মদ আলী খাঁ জয়পুরী (হররঙ্গ), পণ্ডিত ভাত খণ্ডে (বোম্বাই) ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুহম্মদ আলী খাঁ বিখ্যাত ধ্রুপদী ছিলেন, পণ্ডিত ভাত খণ্ডে সম্ভবতঃ এঁর শিষ্য ছিলেন। দেখা যায়, বহু সংখ্যক লক্ষণগীতে ইনি খাঁ সাহেবের ঋণ স্বীকার করেছেন।

রাজা নওয়াব আলী খাঁ তাঁর সা'রিফ-উল-নগমা, দ্বিতীয় খণ্ডে, কয়েকজন বিখ্যাত ধ্রুপদার ধ্রুপদ গানের স্বরলিপি প্রকাশ করে সঙ্গীতের উল্লেখ-যোগ্য খেদমত করেছেন। নওয়াব চম্মন সাহেব, নওয়াব জানী সাহেব, অব্‌বন খাঁ, নজির খাঁ,

আমীর খাঁ, রাজা হোসেন খাঁ, জোহরাবাই, গওহর জান, ওস্তাদ ফৈয়াজ হোসেন খাঁ, পণ্ডিত কৃষ্ণরাও রতনঝঙ্কার, আসাদ আলী, লতাফৎ হোসেন, আল্লাদিয়া খাঁ, শমশাদ বাই, আবদুল করিম, রওশন আরা, হাদ্দু খাঁ, হাস্সু খাঁ, কেরামত আলী খাঁ, তুসাদ্দক হোসেন খাঁ, হায়দর হোসেন, বেলায়েত খাঁ, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, এনায়েত খাঁ, হাফিজ আলী খাঁ, নবু খাঁ, বিসমিল্লাহ্ খাঁ, তালিম হোসেন খাঁ, সাদেক আলী খাঁ, আলী আকবর খাঁ, বান্দু খাঁ, ছোটে খাঁ, প্রসন্ন বণিক, মল্লাং খাঁ, প্রভৃতি নাম কণ্ঠসঙ্গীত, সুরসঙ্গীত ও বাদ্যসঙ্গীতে স্মরণীয় হ'য়ে রয়েছে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে উপযুক্ত স্বরলিপির অভাবে আমরা পূর্ব সূরীদের প্রতিভার বৈশিষ্ট্যকে ধরে রাখতে পারিনি। পাকভারতের প্রথম স্বরলিপির প্রবর্তক হিসাবে কলকাতার মহারাজা সৌরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম স্মরণীয়। আর বর্তমান শতাব্দীতে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে একক মহিমার অধিকারী। অতীত কালে রাজা মানসিং তেওয়ারী ও মুহম্মদ রাজা খাঁ সঙ্গীতের রাগরাগিণী ও শ্রেণীকরণ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্য যা করেছেন, পণ্ডিত ভাতখণ্ডেও একক চেষ্টায় বর্তমান শতাব্দীতে সেই কাজ আরও পরিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করেছেন। তাঁর লক্ষণগীতে স্বরলিপির সাহায্যে রাগ-রাগিণীর ঠাট, স্বরের আরোহণ অবরোহণ ও তানের বিশিষ্ট ভঙ্গী, বাদী-বিবাদী-সম্বাদী স্বরের পূর্ণতর বিবরণ,—ইত্যাদি দিয়ে সঙ্গীত-শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সামনে বর্তমান মার্গ-সঙ্গীতের একটা বোধ-যোগ্য ও প্রামাণিক আদর্শ তুলে ধরেছেন।

অধ্যাপক হালীম সাহেব তাঁর প্রবন্ধগুলোর ভিতর দিয়ে পাক-ভারতের অতীত ও বর্তমান সঙ্গীতের একটা সম্পূর্ণরূপ ফুটিয়ে তুলে একটা বিশেষ জরুরী কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন। এ ছাড়া আমীর খসরু, সুলতান হুসেন শরকী, বাজবাহাদুর, মিয়া তানসেন, মির্জা যুলকারনায়ন, এবং ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর জীবন কথার সাহায্যে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সাঙ্গীতিক আদর্শের প্রতি আলোকপাত করেছেন। পুস্তকাদির অসংখ্য হাওয়ালা দিয়ে গবেষকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হ'য়েছেন। মোট কথা সব কয়টি প্রবন্ধই সুলিখিত হ'য়েছে, আর বিশেষ বিশেষ দিকে নজর দেওয়াতে সবটা মিলে একটা সম্পূর্ণ ধারণা গ্রহণ করবার সুবিধা হ'য়েছে।

এ গ্রন্থে যে-সব তথ্য পরিবেশন আর মত প্রকাশ করা হ'য়েছে, সে সম্বন্ধে

বিশেষ মতদ্বৈধ হওয়ার কথা নয়। তবে মনে হয়, ঐতিহাসিকের লেখা ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনে সন তারিখের উল্লেখ আরও (যথা সম্ভব) পূর্ণতর হ'তে পারতো, আর সময়ানুক্রমিক ভাবে সুলতান হোসেন শরকীর নাম বাজ-বাহাদুরের আগে দিলে অধিক সঙ্গত হ'তো। পরিশেষে যে উৎকৃষ্ট লোক-পঞ্জী দেওয়া হ'য়েছে, সেই সঙ্গে গ্রন্থ-পঞ্জীও থাকলে সুবিধা হতো; অথবা লোকের নামের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর রচিত গ্রন্থাদির তালিকা দেওয়া যেতে পারেতো। গ্রন্থের বহির্পৃষ্ঠ আর একটু আকর্ষণীয় করবার কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে গ্রন্থকার যে উন্নত পর্যায়ের মাল-মসলা পরিবেশন করেছেন, যে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, তাতে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ না করে উপায় নাই।

অধ্যাপক আবদুল হালীম সাহেবকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

কাজী মোতাহার হোসেন